# পট্টিবাজি
বেলাল চৌধুরী

আমাদের গ্রামটা ঠিক শহর বা মফস্বল শহর এমনকী থানা পর্যন্ত না থাকলেও প্রায় শহরের মতোই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে অভ্যস্ত। দৈনিক বাজার, হাট, স্কুল আর সবচেয়ে বড় কথা গ্রামটার বুক চিরে চলে গেছে রেললাইন। গ্রামের অর্ধেকের বেশি মানুষই রেলের চাকুরে। আমাদের গ্রাম থেকে রেলের শহর সেই সঙ্গে বন্দর চট্টগ্রামের দূরত্বও মাত্র ৬৪ মাইলের। যখনকার কথা বলছি তখনও কিলোমিটারের হিসাব চালু হয়নি।

ঘরের ঠিক সামনেটায় বেশ শক্ত করেই একটা কালো রঙের গামছা দিয়ে বাবা আমার চোখ বেঁধে দিলেন, যাতে আমি বাইরের কিছু দেখতে না পাই। তারপর কয়েক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে আমার হাত ধরে চলতে শুরু করলেন। ওই জায়গা থেকে কেবল দু'দিকেই যাওয়া সম্ভব, সুতরাং চোখ বন্ধ অবস্থায় ঘুরপাক খাইয়ে আমাকে দিকভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হলেও আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে মুখ টিপে হাসছিলুম। আমাদের বাড়ির পাশেই, প্রায় ৮০ গজের মধ্যেই রেললাইন। প্রায় সারাক্ষণই রেল চলাচল করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা-না একটা ট্রেন অবশ্যই আসা-যাওয়া করবে। অতএব আমাকে বোকা বানানো বেশ কঠিন কাজই বলতে হবে।

বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়ছিল কদিন ধরে। ডিসেম্বর শেষ হতে চলেছে। বিকেল গড়িয়ে এসেছে এখন, আমরা খুব দ্রুত হাঁটছিলাম। কিছুটা শীত কাটানোর জন্য, কিছুটা শেষ ধাপের উত্তেজনার নাগালে পৌঁছানোর জন্যও বটে। বাবা বেশ শক্ত করেই আমার হাত ধরে রেখেছিলেন যাতে আমি পা হড়কে না পড়ে যাই কিংবা হোঁচট খেলেও যাতে বাবা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারেন। যখন কোনও বাঁকে এসে পৌঁছুচ্ছিলাম বাবা আমার কাঁধ ধরে দাঁড়াচ্ছিলেন। কখনও কখনও আমরা দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, বাবা আবার আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করেন। আমি বেশ মজা পাচ্ছিলাম। এক সময় সত্যি সত্যি মুহূর্তের জন্য হলেও আমি যেন সবকিছুর খেই হারিয়ে ফেলছিলুম। এমন সময়, আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, সন্ধ্যার লোকাল ট্রেনটির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি জানি ওটা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এসেই ওটা প্রায় ষাট ডিগ্রি পশ্চিমে বাঁক নিয়ে হোম সিগন্যালের কাছে আসতে আসতেই আবার সোজাসুজি উত্তরাভিমুখী হয়ে যেতে থাকবে। আজকে কেন জানি না অন্যান্য দিনের চেয়ে গাড়ির শব্দপুঞ্জকে ঢের বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল আমার কাছে। বাবা কি ভাবছিলেন জানি না। ট্রেনটির ব্রেক কষে দাঁড়ানো থেকে আমি অনুমান করতে পারি ওটা দক্ষিণ দিক থেকেই এসেছে এবং ভেতরে আমি এবার চারদিকের একটা ধারণা গড়ে নিতে থাকি। শুধু একটা জিনিসেই কিছুটা খটকা লাগছিল, আমাদের অনেক ছোট ছোট বাঁক বা মোড় ফিরতে হচ্ছিল। মনে হল বাবা আমাকে বিভ্রান্ত এবং প্রতারিত করার জন্যই যেন এসব ছোট ছোট কারুকাজ করছিলেন। হঠাৎ বাবা একটা জায়গায় থেমে, আমার কাঁধে ভর দিয়ে বললেন, এখানটায় তোমার পা-টা একটু উঁচু করে ফ্যালো খোকন। এ কথায় আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। আমি ইচ্ছে করে পা না তুলেই সতর্কতার সঙ্গে মাটিতে পা ঘষে ঘষে দেখলুম ওখানে পা তোলার কোনও প্রয়োজনই নেই। এবার বাবা যখন বুঝতে পারলেন, আমি তার ছোট চালাকিটা ধরে ফেলেছি তখন সত্যি সত্যি একটা এবড়োথেবড়ো জায়গার ওপর এনে তিনি আমাকে এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে বললেন, 'খোকন পা-টা তুলে চল।' কিন্তু তার আগেই আমি হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যাওয়ার মুহূর্তেই তিনি আমাকে জাপটে ধরে তুলে নিলেন।

ততক্ষণে ট্রেনটা স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছে। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা গুম গুম দূরাগত ধ্বনি এসে কানে বাজছিল আমার। শব্দটা ক্রমশ যেন বড় হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আগের

ট্রেনটি স্টেশনে দাঁড়ানো অবস্থাতেই উল্টো দিক থেকে আরেকটি ট্রেন আসছে। তারপর এক সময় দুটো ট্রেন পরস্পর মিলিত হয়ে একই সঙ্গে দুই বিপরীত পথে চলতে শুরু করেছে ফের। ট্রেনের শব্দ থেকে বুঝতে পারলুম আমরা এক্কেবারে রেললাইনের ধারে এসে গেছি। কিন্তু শেষ ক'টি ঘূর্ণাবর্ত আবার আমাকে বিভ্রান্ত্ম করে তুলল। আমরা কোন রাস্ত্মায় এসে দাঁড়িয়েছি আমি কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারছিলুম না। এটা রেললাইনের কাছাকাছি তিনটে রাস্ত্মার যে কোনও একটা হতে পারে। আবার এও মনে হচ্ছিল এতটা পথ কখনইবা এলাম।

রাস্ত্মাটা যেন কিছুটা ওপরের দিকে উঠে গেছে মনে হচ্ছিল। আমরা বোধহয় রেলব্রিজের রাস্ত্মায় এসে গেছি, কিন্তু ওটা তো আরও ঢের খাড়া হওয়ার কথা। তাহলে, আর কোন রাস্ত্মা ধারে-কাছে কিছুটা উঁচুর দিকে ওঠানো খোলা চোখে হাঁটার সময় সত্যি এসব ছোটখাটো ব্যাপার নজরেই আসে না। কোন রাস্ত্মা কতটা উঁচু বা কতটা নিচু কখনও খেয়াল করে দেখিনি। আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। অথচ চোখ বন্ধ করে চলতে গিয়েই মনে হচ্ছে কেন এগুলো আগে আরও ভালো করে লক্ষ করিনি। আরেকটা জিনিস দেখলুম, চোখ বন্ধ অবস্থায় বাইরের শব্দগুলোও কেমন প্রখর আর তীব্র হয়ে আসে কানে। গামছাটা এত শক্ত আর পুরু করে বাঁধা হয়েছে যে, আমি আর বাইরের আলোর সামান্যতম আভাসটুকুও দেখতে পাচ্ছিলাম না। একেবারে নিরন্ধ্র অন্ধকার। কিন্তু হঠাৎ মনে হল যেন ওই নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেঙে একটা বিশাল আলো তরঙ্গ ফেটে পড়ল। চোখের পাতার নিচে নাচতে লাগল নানা রঙের আলোর ঝিঁ ঝিঁ। টের পেলাম কোনও ল্যাম্পপোস্টের নিচে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। কেননা বিজলি আলোর একটানা মৃদু্য গুনগুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। পায়ের আওয়াজ থেকে টের পাচ্ছিলাম কোনও প্রশস্ত্ম এবং চমৎকার রাস্ত্মার ওপর দিয়ে হাঁটছি আমরা। এ সময় আরেকটা ট্রেন আমাদের অতিক্রম করে গেল। কিন্তু শব্দটা এবার বেশ দুর্বল। মনে হচ্ছে আমরা রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে এসে গেছি। রেললাইন থেকে কোন রাস্ত্মাটা চওড়া আর সুন্দর হয়ে বেরিয়েছে মনে করার চেষ্টা করছিলুম। ধ্যুচ্ছাই কিছুতেই মনে আসছে না। হতাশ হয়ে শেষমেশ বিরত হলাম ব্যর্থ প্রয়াস থেকে। এতক্ষণে আমি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলুম যে, আমরা কোথায় আছি, আমি জানি না এবং বাবাও কিছু জিজ্ঞেস করছেন না। সুতরাং আমাদের খেলাও যথারীতি চলতে থাকল। হার-জিতের তো প্রশ্ন ওঠেই না। কিন্তু বাবার ব্যবহার থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম, বাবা ভাবছেন আমরা কোথায় আছি এটা আমি জানি। যার জন্য বাবা আরও খানিকটা হাঁটছিলেন অর্থাৎ ঘুরাঘুরি করছিলেন আমাকে নিয়ে। আসলে আমাদের এ খেলাটা আমাদের দৈনন্দিন সান্ধ্য ভ্রমণকে কিছুটা উত্তেজক করে তোলার একটা উপায় হিসেবেই নিয়েছিলুম আমরা।
এবার একটা মোটর গাড়ি গেল আমাদের পাশ দিয়ে খুব ধীরগতিতে। আমাদের অতিক্রম করার সময় ওটা গিয়ার বদলে ডানদিকে ঘুরে গেল, আমি ইঞ্জিনের শব্দ থেকেই টের পেলাম। আর যেন মনে হচ্ছিল গাড়িটা একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজের পদশব্দের পদধ্বনি থেকেও আমার একথাই মনে হচ্ছিল। প্রতিধ্বনিগুলো যতই ব্যাপক এবং বড় হয়ে উঠছিল ততই বাবা আমাকে বার বার এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিলেন। এক সময় মনে হল প্রতিধ্বনি ছাড়িয়ে আমরা অনেক দূর এসে গেছি। ব্রিজটির অবস্থান আমি ঠিকই মনে করতে পারছিলুম, কিন্তু পার্শ্ববর্তী কোনও প্রশস্ত্ম রাজপথ এবং সেই রাজপথের সঙ্গে রেলপথের কোনও যোগাযোগ ঘটাতে পারছিলুম না। অর্থাৎ আমি এখন কোথায় বা কোন পথে আছি আমি কিছুই জানি না বা বলতে পারব না।
এবার মনে হল আমরা যেন আরেকটা রাস্ত্মার মোড়ে এসে পৌঁছলাম। আবার আমরা একটা সরু এবং সংকীর্ণ পথে এসে পড়লাম। পেছন থেকে যেন একটা ট্রেন চলার শব্দ পেলাম। স্টিম ইঞ্জিনের হিসহিস ঘষটানো শব্দ উঠছিল। মনে হচ্ছিল রেললাইন থেকে সত্যি আমরা অনেকটা দূরে এসে গেছি। সময়জ্ঞানও আমার চির খেয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। তবে আন্দাজ করতে পারছিলুম যে, আধ ঘণ্টা-

পঁয়তালিস্লশ মিনিটের বেশি হবে না। তাছাড়া বাড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার সময়ও হয়ে এসেছে। ফিরে বিকেলের চা খেতে হবে। মা অপেক্ষা করছেন। বাবা নিশ্চয়ই এক্ষুণি বলবেন ঘরে ফেরার কথা। এখন হাঁটতে গিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা যেন নিচু ঢালুর দিকে হেঁটে চলেছি। আবার অনেক খানা-খন্দক পার হতে হচ্ছিল। বাবা অবশ্য এখন আর আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিলেন না। আমি প্রতি পদক্ষেপেই টের পাচ্ছিলুম ওগুলো সত্যিকারের খাদ।

অন্যান্য দিনের চেয়ে এ ধরনের ঘোরাফেরাটা আজকে ঢের বেশি দীর্ঘতর ছিল এবং এই প্রথমবারের মতো আমি সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত্ম হয়ে পড়লুম। সত্যি বলতে কি, এই প্রথমবারের মতো এ ধরনের ঘোরাফেরায় আমি কিছুটা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছি। কেনইবা আমরা এতক্ষণ ধরে হাঁটছিলুম আর কেনইবা আমার এত চেনা পারিপার্শ্বিককে এরকম বেমালুম ভুলে বসে আছি, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। কী করে এটা সম্ভব হল। কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর আমরা জানা ছিল না। অজ্ঞাতসারেই আমি বাবার হাত চেপে ধরলুম জোরে। এক মুহূর্ত পরেই বাবা থমকে দাঁড়ালেন।

‘এখন বল তো খোকন, আমরা কোথায় আছি।’

আমি ইতস্ত্মত করছিলুম।

‘বলতে পারিস এখন আমরা কোথায়?’

কিছু একটা বলতে হয় বলেই বললুম, ‘দেওদার রোড’, অন্ধকারে গুলি ছোঁড়ার মতো। আসলে আমরা কোথায় আছি এ সম্পর্কে আমার সামান্যতম কোনও ধারণা ছিল না। বাবা বেশ উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন।

দেওদার রোড না? আমি বোকার মতো আবার বললুম। ‘অথবা তার কাছাকাছি...’ আমি বলি।

বাবা তখনও হেসে চলেছেন। আমি সত্যি বুঝতে পারছিলুম না এতে অত হাসির কী আছে। এই প্রথম বাবা খেলাটাতে জিতলেন, কিন্তু এত হাসছেন কেন আর কেনইবা আমরা এতটা দীর্ঘ সময় হাঁটলুম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে, মা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য।

‘তুই কি তাহলে হাল ছেড়ে দিয়েছিস?’ বাবা জিজ্ঞেস করেন অবশেষে।

‘ঝাউতলা রোড’। আমি যে সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ছি এটা আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে স্বীকার করে নিলুম। বাবা ফের হেসে উঠলেন।

‘তুই তাহলে মেনে নিচ্ছিস?’

‘হ্যাঁ’ আমি বললুম।

বাবা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আমার বাঁধন খুলে দিলেন। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম বাবা কেন হাসছেন। আমরা ঠিক আমাদের ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। ‘শেষ পর্যন্ত্ম আমি তোকে হারালুম’ বলতে বলতে সকৌতুকে আবার আমার হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। আমিও এবার হাসতে লাগলুম। আমরা দুজনেই হাসছিলুম। আমাদের এ ধরনের ‘হাসি’ দেখে মা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হলেন। দরজা থেকেই বললেন চেঁচিয়ে ‘তোমাদের চা দিয়েছি’।

চা খেতে খেতে বাবা কোন কোন পথে আমরা ঘুরেছি তার বিবরণ দিচ্ছিলেন। বাবার বর্ণনা শুনে, আমি কিছুতেই ভাবতে পারছিলুম না, বাবা কি করে আমাকে এতটা বোকা বানাতে পারলেন। আমার ধরাণা ছিল, আমার পরিপার্শ্ব এবং প্রতিবেশকে আমি এতটাই পুপখানুপুপখ জানি বা চিনি যে, বাবা কখনও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। কিন্তু, তবু তিনি সাফল্য লাভ করেছেন, এই সত্য কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আমি স্থির নিশ্চিত ছিলুম যে, আমার চোখ সম্পূর্ণ বেঁধে দিলেও আমার নিজের পাড়াতে আমি কখনোই হারাব না। আমি কখনোই ভাবতে পারিনি বাবার হাত ধরে রাখা সত্ত্বেও আমি ভয় পেতে পারি, কারণ স্বভাবের দিক থেকে আমি কখনোই ভীতু ছিলুম না।

মা বাবার সাফল্যে মিটি মিটি হাসছিলেন। বাবাও ফের হাসতে শুরু করলেন। আমার খুব খুশি খুশি লাগছিল, কেননা আমার বাবা-মা সত্যিকার অর্থে সুখী হয়েছিলেন।